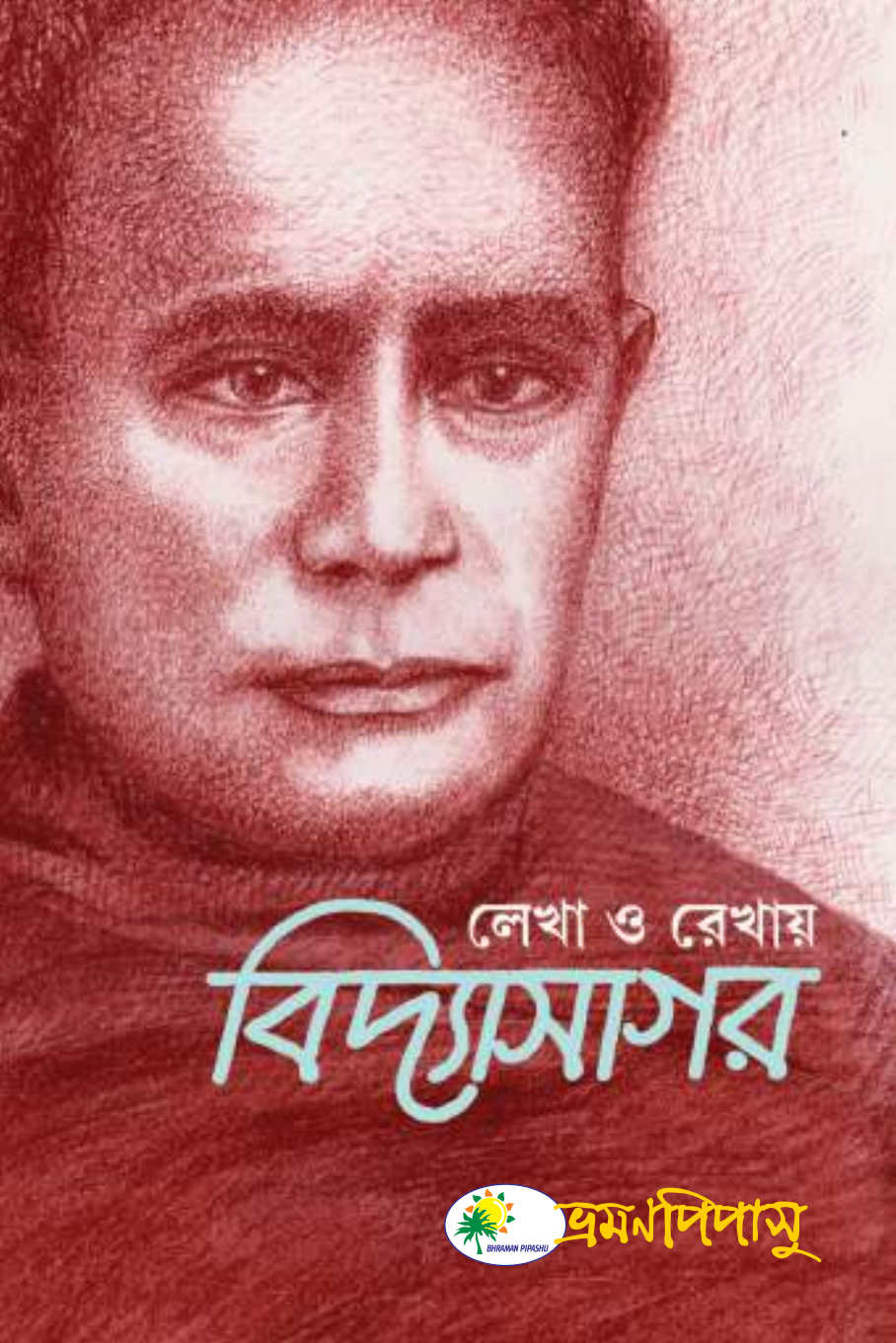
লেখা ও রেখায়
বিদ্যাসাগর
ভ্রমণপিপাসু
BHRAMAN PIPASHU

রীতা রায় ঃ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পেন্টিং নিয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেছেন। বর্তমান চিত্র-শিক্ষাদানের পাশাপাশি নিয়মিত ভাবে চিত্রচর্চার সঙ্গে যুক্ত।

অর্জুন মুখোপাধ্যায় ঃ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পেন্টিং নিয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেছেন। বর্তমান চিত্র-শিক্ষাদানের পাশাপাশি নিয়মিত ভাবে চিত্রচর্চার সঙ্গে যুক্ত।

লেখা ও রেখায়
বিদ্যাসাগর

ভ্রমণপিপাসু
BHRAMAN PIPASHU
ইই-৩৭এ/১, সেক্টর-২, সল্টলেক
কলকাতা-৭০০ ০৯১

লেখা ও রেখায় বিদ্যাসাগর
Lekha O Rekhay Vidyasagar

প্রথম প্রকাশ ঃ ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২০

গ্রন্থস্বত্ব ঃ প্রকাশক

সম্পাদনা, গ্রন্থনা ও বিন্যাস ঃ সৌমেন চক্রবর্তী
প্রকাশক ঃ মিলন গঙ্গোপাধ্যায়
কর্মসচিব ঃ সমীর দাস

প্রচ্ছদ ঃ রীতা রায়
ছবি ও লেখা ঃ অর্জুন মুখোপাধ্যায়
উপদেষ্টা ঃ অধ্যাপক অমরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অক্ষর বিন্যাস ও মুদ্রণ
এক্‌মি এন্টারপ্রাইজ
১ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯
মোবাইল ঃ ৯৮৩০০৬০৩০৬

প্রাপ্তিস্থান
ভ্রমণপিপাসু
ইই-৩৭/১, সেক্টর-২, সল্টলেক, কলকাতা-৭০০ ০৯১
মোবাইল ঃ ৮৬৯৭১৬৬৭১৩, ৮৯১০১৫৫৩৫৫

বিনিময় ঃ ৫০ টাকা

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঃ নবপ্রভাত-রশ্মি

‘‘বঙ্গ সাহিত্যের রাত্রি স্তব্ধ ছিল
তন্দ্রার আবেশে
অখ্যাত জড়ত্বভাবে অভিভূত।
কী পুণ্য নিমিষে
তব শুভ অভ্যুদয়ে বিকিরিল প্রদীপ্ত প্রতিভা
প্রথম আশার রশ্মি নিয়ে এল প্রত্যুষের বিভা।
বঙ্গভারতীর ভালে পরালো প্রথম জয়টিকা।’’

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথের এই সশ্রদ্ধ নিবেদন আমাদের জাতির সোৎসারিত শ্রদ্ধাঞ্জলি।

বিদ্যাসাগরের জীবন ও কর্মকাণ্ড আলোচনা করলে বিস্ময়াবিষ্ট হতে হয়। তিনি ছিলেন একজন যথার্থ মানুষ। তাঁর জন্মের দ্বিশতবর্ষে ‘‘লেখা ও রেখায় বিদ্যাসাগর’’ শীর্ষক একটি গ্রন্থ প্রকাশ করে ভ্রমণপিপাসু-র শ্রদ্ধা নিবেদন। সুধী পাঠকবৃন্দ ও সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে সমাদৃত হবে আশা করি।

ধন্যবাদান্তে
সৌমেন চক্রবর্তী
সম্পাদক
(চলভাষ ঃ ৮৬৯৭১৬৬৭১৩)

প্রাক্‌কথন

বিদ্যাসাগর মশাইয়ের দ্বিশততম জন্মবর্ষে এক সুন্দর তথ্যসমৃদ্ধ উপহার এই ছবি-লেখায় ভরা এই গ্রন্থটি। বাঙালী বাবা-মায়েরা যখন পড়ার বইয়ের বাইরের জগতটাকে সন্তানদের থেকে আগলে রাখেন, সেইসময় এই গ্রন্থ প্রকাশনা সাহসী উদ্যোগ ও অভিনন্দনযোগ্য। এ ধরনের উদ্যোগ আরও অনেকে নিচ্ছেন। কিন্তু লক্ষ্য যারা, তাদের কাছে পৌঁছাতে হবে এবং পড়াতে হবে।

এই বাংলার মেয়েরা অজান্তেই বিদ্যাসাগরমশাইয়ের ২০০তম জন্মবর্ষের শ্রেষ্ঠ উপহারটি দিয়েছেন। মাধ্যমিক পরীক্ষা ও মাদ্রাসা পরীক্ষায় প্রকাশিত ফলে দেখা যাচ্ছে দুটিতেই ছাত্রীরা ছাত্রদের চেয়ে বেশী সংখ্যায় উত্তীর্ণা হয়েছেন।

নারীশিক্ষা প্রসারে বিদ্যাসাগরমশাই জেলায় জেলায় বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ছাত্রদের বিদ্যালয়ের সঙ্গেই। এমনকি সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানও ছিল। ব্রিটিশ শাসকরা শিক্ষার এহেন প্রসারের পক্ষে ছিলেন না; ছোটলাটের মৌখিক প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও অর্থ বরাদ্দ বন্ধ হয়। বিদ্যাসাগর ৫০০ টাকা বেতনের সরকারী চাকরি ত্যাগ করেন। নিজ অর্থে শিক্ষা প্রসারের উদ্যোগ অব্যাহত রাখেন।

প্রকাশন সংস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য।

৭ আশ্বিন, ১৪২৭

পার্থ সেনগুপ্ত
সম্পাদক
বিশ্বকোষ পরিষদ
প্রতিষ্ঠাতা সদস্য
বীরসিংহ বালিকা বিদ্যালয়
বীরসিংহ গ্রাম

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে অনেক মহাপুরুষের জন্ম হয়, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশে শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ছিল অসামান্য।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮২০ খ্রিস্টাব্দের ২৬ সেপ্টেম্বর অধুনা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার (তদানীন্তন হুগলী জেলা) বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের বাবা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় চাকরি করতেন। পরিবার নিয়ে শহরে বাস করা সম্ভব ছিল না, তাই বালক ঈশ্বরচন্দ্র মায়ের সাথে গ্রামেই বাস করতেন।

পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মা ভগবতী দেবী। সেই আমলেও ভগবতী দেবী ছিলেন আধুনিক চিন্তার অধিকারিণী। পাণ্ডিত্যের জন্য তাদের পরিবারের সুনাম থাকলেও আর্থিক অবস্থা মোটেও ভালো ছিল না। পিতার ন্যায়নিষ্ঠা, নীতিপরায়ণতা, সততা, অধ্যাবসায় ইত্যাদি গুণ পরবর্তীকালে পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রের মধ্যে বিকশিত হয়েছিল।

চার বছর নয় মাস বয়সে ঠাকুরদাস বালক ঈশ্বরচন্দ্রকে গ্রামের সনাতন বিশ্বাসের পাঠশালায় ভর্তি করে দেন। কিন্তু সনাতন বিশ্বাস শিক্ষাদানের চেয়ে শাস্তিদানেই অধিক আনন্দ পেতেন। সেই কারণে আট বছর বয়সে পাশের গ্রামের কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পাঠশালায় ভর্তি হন। তাঁর চোখে কালীকান্ত ছিলেন আদর্শ শিক্ষক।

পাঠশালার পাঠ শেষ করে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে পিতার সাথে পায়ে হেঁটে কলকাতায় আসেন। ছেলেবেলা থেকেই অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র। কথিত আছে, কলকাতায় আসার পথে রাস্তার ধারে মাইলফলক দেখে ইংরেজি সংখ্যাগুলো তিনি অনায়াসেই চিনে ফেলেন।

কলকাতায় বড়বাজারে বিখ্যাত সিংহ পরিবারে তিনি আশ্রয় পান। সেখানে রাইমনি দেবীর স্নেহের পরশে ঈশ্বরচন্দ্র মা-কে ছেড়ে আসার কষ্ট ভুলেছিলেন।

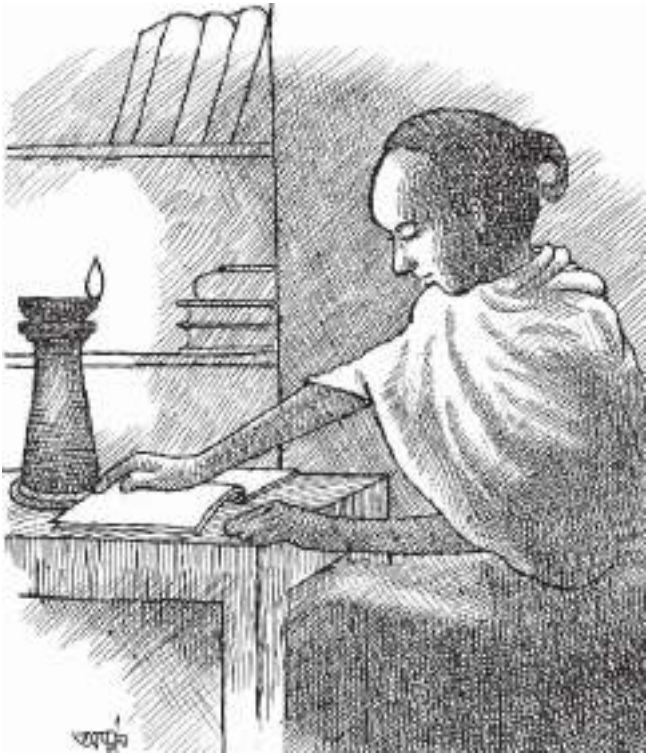

দুবেলা একা হাতে পরিবারের যাবতীয় কাজ করার পর অধিক রাতে ঈশ্বরচন্দ্র পড়তে বসার সময় পেতেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের পড়াশোনার প্রতি অনুরাগের কাহিনী কিংবদন্তী হয়ে আছে। কথিত আছে, ঘরে প্রদীপ জ্বালানোর পর্যাপ্ত তেল না থাকলে তিনি রাস্তার গ্যাসবাতির আলোয় অনেক রাত পর্যন্ত পড়াশোনা করতেন।

১৮২৯ খ্রিস্টাব্দের ১ জুন কলকাতার সংস্কৃত কলেজে (বর্তমানে সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল) ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হন। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের ইংরেজি বিভাগেও ভর্তি হন ঈশ্বরচন্দ্র। অপরিসীম অধ্যাবসায় ও নিষ্ঠার সঙ্গে পড়াশোনা করে তিনি স্কুলের পরীক্ষায় কৃতিত্বের পরিচয় দেন এবং মাসিক পাঁচ টাকা বৃত্তি লাভ করেন।

সংস্কৃত কলেজে দীর্ঘ ১২ বছর ৫ মাস পড়াশোনা করে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু ল কমিটির পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করেন। জন্মগ্রহণকালে তাঁর পিতামহ নাম রেখেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এই শংসাপত্রটি পাওয়ার পর তাঁর নামের সাথে বিদ্যাসাগর উপাধিটি ব্যবহার হওয়া শুরু হয়।

১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে মাত্র একুশ বছর বয়সে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগের প্রধান পণ্ডিতের পদে যোগদান করেন, বেতন ছিল মাসিক ৫০ টাকা। তিনি একই সাথে বিদ্যালয় পরিদর্শকের দায়িত্বও পালন করতেন। ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে ঐ একই বেতন হারে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের ভার গ্রহণ করেন। তখন তাঁর বয়স পঁচিশ বছর।

১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দের ১ মার্চ মাসিক ৮০ টাকা বেতনে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে হেডরাইটার ও কোষাধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। ঐ বছরই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে ইস্তফা দিয়ে ৫ ডিসেম্বর সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দের ২২ জানুয়ারি ১৫০ টাকা বেতনে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।

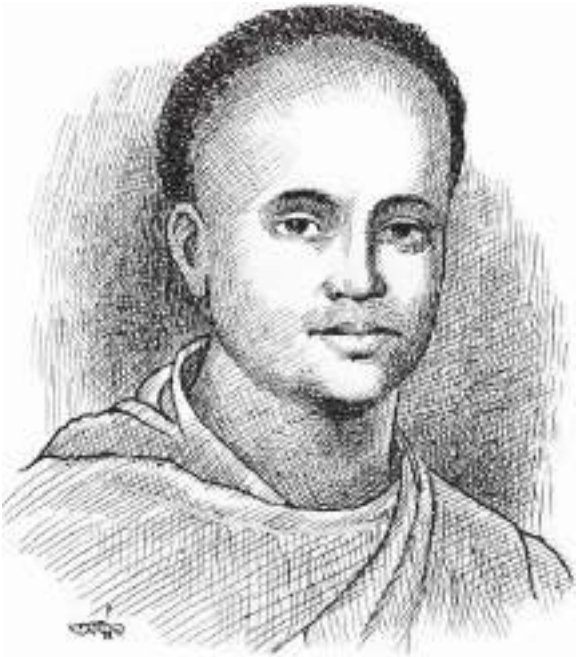

১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রামে স্থাপন করেন অবৈতনিক বিদ্যালয়। এই বছরেই তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ব্যাকরণ কৌমুদী প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ অবলম্বনে রচনা করেন শকুন্তলা গ্রন্থ। এছাড়াও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় বিধবা বিবাহ প্রচলন হওয়া উচিত কিনা শীর্ষক একটি প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়।

১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে বাংলা নববর্ষের দিন যুগান্তকারী বাংলা শিশুপাঠ্য বর্ণমালা শিক্ষাগ্রন্থ বর্ণপরিচয় প্রকাশিত হয়। কথিত আছে, মফস্বলে স্কুল পরিদর্শনে যাওয়ার সময়ে পালকিতে বসে তিনি বর্ণপরিচয়ের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন।

১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দেই দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় মোট উনিশটি বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপন করেন। ঐ বছর জানুয়ারি মাসে 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিৎ কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব'—প্রথম পুস্তক প্রকাশ করেন। অক্টোবর মাসে এই বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশ করেন। এছাড়াও বিধবা বিবাহ আইনসম্মত করতে সরকারের নিকট বহু স্বাক্ষর সংবলিত এক আবেদনপত্রও পাঠান।

ঈশ্বরচন্দ্র ও তাঁর বন্ধুরা মিলে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের ৭ ডিসেম্বর রক্ষণশীল সমাজের বিক্ষোভ ও প্রচণ্ড বিরোধিতা অগ্রাহ্য করে এক বিধবার বিবাহ দেন। পাত্র ছিলেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। পাত্রী বর্ধমান জেলার পলাশডাঙার দ্বাদশ বর্ষীয়া বিধবা কন্যা কালীমতী মুখোপাধ্যায়।

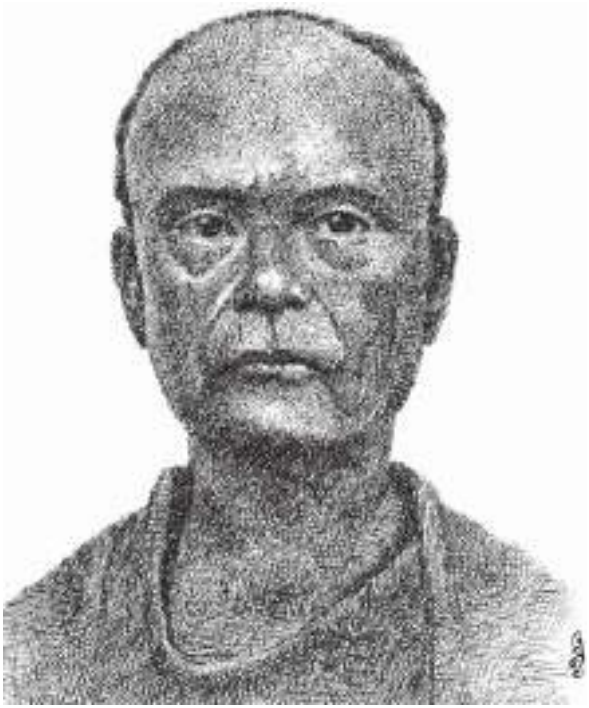

বিধবা বিবাহের স্বপক্ষে শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেওয়া ছাড়াও এর জন্য একটি আইন প্রণয়নের দাবীতে তিনি সামাজিক আন্দোলন শুরু করেন। এই আন্দোলনে দেশের অন্য প্রদেশের মানুষরাও সামিল হন। দেশের রক্ষণশীল সমাজের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে বিধবা বিবাহ আইন চালু হয়।

ছবি ঃ সংগৃহীত

বাংলায় নারী শিক্ষা বিস্তারের পথিকৃত ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি ড্রিংক ওয়াটার বেথুনের সাথে উদ্যোগী হয়ে ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এটিই দেশের প্রথম বালিকা বিদ্যালয়, বর্তমানে এটি বেথুন স্কুল নামে পরিচিত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী সমাজের রক্ষণশীল অংশ মনে করত নারীদের শিক্ষা দেওয়া উচিৎ নয়। অন্যদিকে ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন নারীশিক্ষার বিশেষ সমর্থক। তিনি মনে করতেন নারী জাতি শিক্ষিত না হলে কোন সমাজের উন্নতি সম্ভব নয়। সেজন্য সরকারের সাহায্য নিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নারীদের শিক্ষিত করার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

ছবি ঃ সংগৃহীত

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৪ জানুয়ারি স্থাপিত হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। এর পরিচালন সমিতির অন্যতম সদস্য তথা ফেলো মনোনীত হন বিদ্যাসাগর মহাশয়। উল্লেখ্য এই সমিতির ৩৯ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ছয় জন ছিলেন ভারতীয়।

সোমপ্রকাশ।

১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ১৫ নভেম্বর প্রকাশিত হয় সোমপ্রকাশ নামে একটি বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা। এই পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনার নেপথ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যথেষ্ট অবদান ছিল। দেশীয় ভাষায় এটিই প্রথম পত্রিকা যাতে রাজনৈতিক বিষয় স্থান পেয়েছিল।

১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দের ৪ জুলাই লণ্ডনের রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি তাঁকে সাম্মানিক সদস্য নির্বাচিত করে। খুব কম ভারতীয় এই বিরল সম্মানের অধিকারী হতে পেরেছিলেন।

বিধবা বিবাহ চালু করা, বহুবিবাহ রদ করা ইত্যাদির প্রশ্নে আন্দোলন গড়ে তুলতে গিয়ে বিদ্যাসাগর সমাজের রক্ষণশীল অংশের কাছ থেকে প্রবল বাধা পান। নিজের সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করে তিনি সামাজিক সংস্কারে নামেন। তবুও তাঁর বিষয়ে তুমুল কুৎসা ও অপপ্রচার চালানো হয়। এর ফলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে।

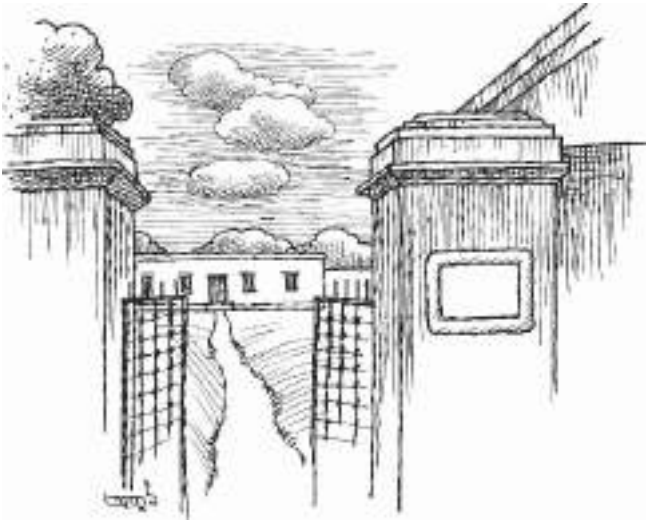

জলহাওয়া পরিবর্তনের জন্য তিনি কার্মাটারে (বর্তমানে ঝাড়খন্ড রাজ্যে অবস্থিত) একটি বাগানবাড়ি কেনেন। সেখানে একটি বিদ্যালয়ও স্থাপন করেন। কার্মাটারের স্থানীয় সাঁওতাল জনজাতির মানুষের সরলতা ও তেজদীপ্ত মানসিকতা বিদ্যাসাগরকে মুগ্ধ করে। তিনি সংবেদনশীল মন নিয়ে সাঁওতাল সমাজের সাথে মেলামেশা করতে থাকেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খুব অল্প বয়স থেকেই অসহায় মানুষের সেবার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় তীব্র অন্নসংকট দেখা দিলে ঈশ্বরচন্দ্র বীরসিংহ গ্রামে নিজ ব্যয়ে একটি অন্নসত্র স্থাপন করেন। দীর্ঘ ছয় মাস ব্যাপী দৈনিক চার-পাঁচশো নরনারী ও শিশু এই অন্নসত্র থেকে অন্ন, বস্ত্র ও চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছিলেন।

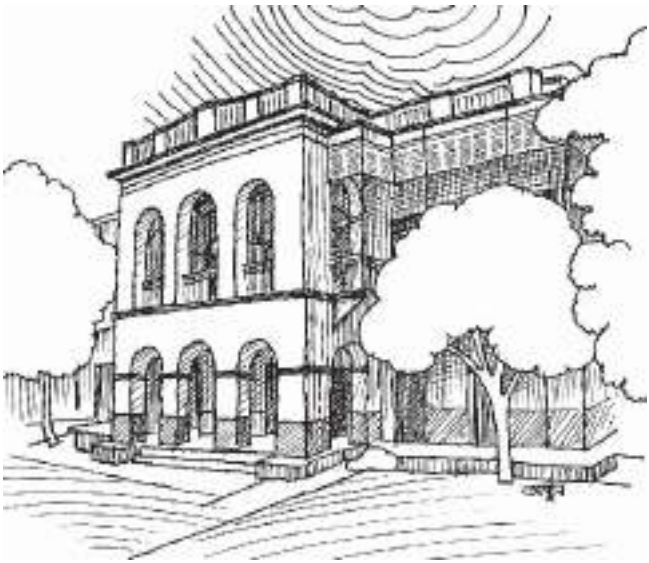

১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয় কলকাতার বাদুড়বাগানে বসতবাড়ি নির্মাণ করেন। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে তিনি এই বাড়িতে বসবাস করতে শুরু করেন। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জুলাই রাত ২টো ১৮ মিনিটে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। বাংলার নবজাগরণের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রয়াণের সঙ্গে একটি যুগের অবসান ঘটে।